রবি আলোয় গোরা

By Prof. Dr. Anurupa Mukhopadhyay

এম. এ (4th Sem)

Date of Lecture: ১২/১২/১৮

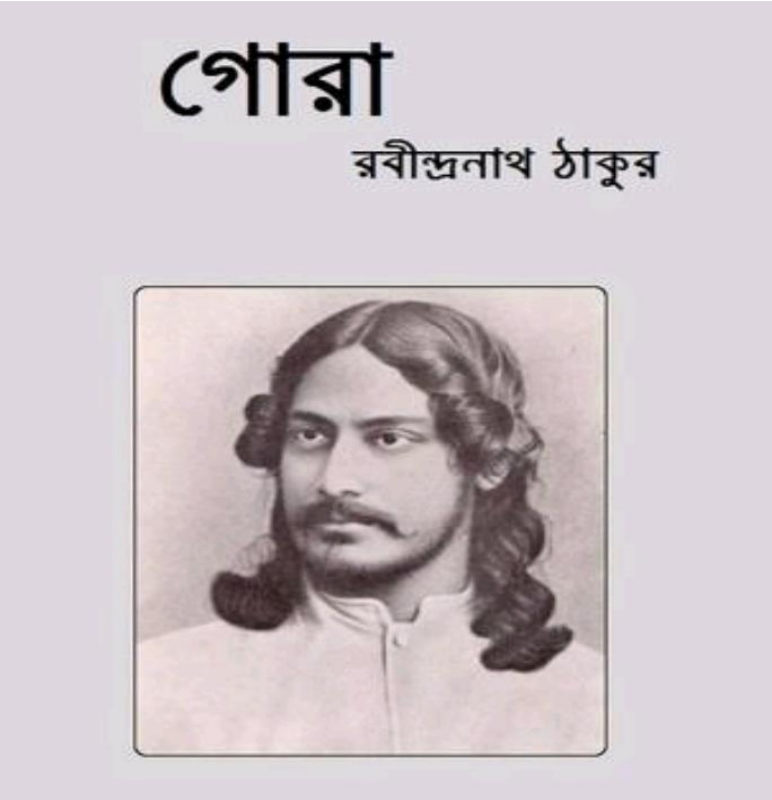

১. ছোটবেলা থেকে প্রচলিত মতের উপর ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথের যে ধারণা গড়ে উঠেছিল মনের মধ্যে, তার গদ্য- উপন্যাস আর প্রবন্ধ- পড়তে গিয়ে সেই ধারণার অসারতা ক্রমশ ধরা পড়ছে। আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রধান পরিচয় তিনি একজন রোমান্টিক এবং অধ্যাত্মবাদী কবি, তবে বাস্তবে অধিকাংশ বাঙালির জীবনের সাথে তার যোগাযোগ মূলত তার গানের মাধ্যমেই। তার গানের মাধ্যমে তিনি বাঙালির জীবনের এত দিক স্পর্শ করে গেছেন যে অধুনা অনেকে বাঙালিত্ব আর রবীন্দ্রনাথকে প্রায় সমার্থক হিশেবেই গণ্য করে থাকেন্। মোটের উপর কথাটা সত্য সন্দেহ নেই। বাঙলায় একজন

মানুষ স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠলে তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব অনুভূতি-অভিজ্ঞতার সম্মিলন হবে, রবীন্দ্রনাথ তার ঋষিসুলভ ক্ষমতার জোরে তার প্রায় সবটুকুরই জানান দিয়ে যান কেবলমাত্র তার গানেই। কিন্তু তার কথাসাহিত্য পড়ে দেখছি শুধু এমনকি বাঙালিত্বের মধ্যে আটকে থাকার মত ছিলেন না তিনি। যে মিস্টিক রোমান্টিকতায় তার গান বা কবিতাকে সংরক্ত হতে দেখি তার অনেক গল্পে বা কিছু উপন্যাসেও সেই রোমান্টিকতার আনাগোনা আছে ঠিকই, কিন্তু তার কল্পনা বা মগজ শুধু রোমান্টিকতাকেই আটকে থাকে না। বরং কোন এক বিচিত্র শক্তির জোরে কথাসাহিত্যে তাকে চূড়ান্তভাবে বাস্তবসংলগ্ন হতে দেখা যায়, এই বাস্তবসংলগ্নতা এতই নিবিড় যে 'গোরা'র মত বিপ্লবী উপন্যাসও তার হাত ধরেই বের হয়ে আসে। কথাসাহিত্যে সম্পূর্ণ এক রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করে প্রথমেই একটা ধাক্কা খাই। বুঝতে পারি তার সম্পর্কে বাজারে প্রচলিত অনেক কথাই আসলে মিথ, বাস্তবের রবীন্দ্রনাথ শুধু রোমান্টিক ঋষিকবিই নন, বরং তিনি একই সাথে বিপ্লবী এবং বাস্তবতাসংলগ্ন এক মহৎ সত্যদ্রষ্টা।

গোরাএক বিপ্লবের জন্ম

২. গোরা উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের দিকে একবার আলো ফেললে বুঝা যায় রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমাজের ঠিক কতটুকু গভীরে পৌছে যেতে পেরেছিলেন। গোরার সব চরিত্রই অদ্বিতীয়, এদের প্রত্যেকেই অন্যের থেকে আলাদা। চরিত্র রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধি যে প্রশ্নাতীত তার প্রমাণ তার অন্যান্য উপন্যাসেও পাওয়া যায়, গোরায় এই সিদ্ধির চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখি। কিন্তু গোরা পড়তে গিয়ে আমাদের খেয়াল হয়, শুধুমাত্র চরিত্র রূপায়নে দক্ষতাই এখানে সব নয়, বরং যে উদ্দেশ্য নিয়ে গোরা লিখিত হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য পূরণে ঠিক এই চরিত্রদেরকেই দরকার ছিল, এমনকি তাদের প্রতিটা কাজ বা বক্তব্যের সাথে সামগ্রিকভাবে পুরো উপন্যাসের গতিরও একটা পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। যেন সব চরিত্র নিজ নিজ ভাবে এবং সবাই একসাথে একই পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে!

পুরো উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের ভেতরের ও বাইরের বিভিন্ন টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর একদম শেষে যখন আমরা সেই অন্তিম পরিণতিতে এসে পড়ি, তখন এটা ভেবে অবাক না হয়ে উপায় থাকে না, শুধু এমনকি শ্রেষ্ঠ শিল্পী নন, রবীন্দ্রনাথ একই সাথে ছিলেন চূড়ান্ত স্বপ্নদ্রষ্টাও। প্রায় একশো বছর আগে এই পরিণতিকে খুঁজে পেলেও সমসাময়িকেও এই পরিণতি গ্রহণযোগ্য, বাস্তব, এবং মোক্ষম। গোরা উপন্যাস লিখিত হয়েছে শুধুমাত্র এই পরিণতিতে যাওয়ার জন্যেই, যে পরিণতি বর্ণিত হয়েছে মাত্র শেষ দুই পৃষ্ঠা জুড়ে, কিন্তু এতে পৌছানোর জন্য প্রস্তুতি ছিল প্রায় সাড়ে তিনশো পৃষ্ঠার!

৩. একজন চূড়ান্ত অধ্যাত্মবাদী কবি কিভাবে তার উপন্যাসে দ্ব্যর্থহীনভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেন যে ভারতবর্ষ বা সমগ্র মানবতার মুক্তির একমাত্র উপায় সকল ধর্মমতের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষকে শুধু মানুষ হিশেবে দেখার ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং সংকল্প? এই কূটাভাসের একমাত্র ব্যাখ্যা এটা নয় যে রবীন্দ্রনাথ আসলে অধ্যাত্মবাদী নন, বরং এটাই যে রবীন্দ্রনাথকে শুধু অধ্যাত্মবাদী বা শুধু বাস্তববাদী বলে প্রমাণ করা সম্ভব নয়; যদি কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় তাকে ফেলতেই হয় তাহলে একমাত্র 'সংশয়বাদী' বলাই অধিকতর যৌক্তিক বলে মনে হয়।

কারণ দেখি গোরার ঠিক আগের উপন্যাসই 'নৌকাডুবি'! গোরার প্রথাবিরোধিতার সাথে নৌকাডুবির তীব্র রক্ষণীশীলতা মারাত্মকভাবে বেমানান। পরপর দুইটি উপন্যাস পড়লে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় দুইটি উপন্যাস একই ব্যক্তির লেখা। কোন দৈব এবং আকস্মিক ঘটনায় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে বলে ইতিহাসে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণও পাওয়া যায় না। তাছাড়া গোরার পরবর্তীতেও গোরার মত আর কিছুই কখনও লিখেননি তিনি। বুঝা যায় এই লেখকের সারা জীবন একটা দার্শনিক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে গেছে, কখনও তিনি ঠিক করে উঠে পারেননি ঠিক কোন পথটা তার পথ। এ কারণেই তার লেখার মধ্যে রক্ষণশীলতা থেকে উদারনৈতিকতা পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্পেকট্রামটাই ধরা পড়ে।

৪. একজন শিল্পী হিশেবে রবীন্দ্রনাথের উৎকর্ষ নিয়ে কিছু বলা অতিকথন। কিন্তু একজন পুরোদস্তুর রোমান্টিক কবি কীভাবে কথাসাহিত্যেও শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেন তা কৌতূহলোদ্দীপক, একই সাথে অনুধাবনের অগম্যও বটে। কারণ আধুনিক কথাসাহিত্য অনেক বেশি বাস্তবতাসংলগ্ন, আর কবিতার সাথে যদিও বাস্তবতার একটা যোগ থাকেই, তথাপি কবিতা যতটা না বাস্তবের তার চেয়ে বেশি অতিবাস্তবের, বা কল্পনার।

ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠদের কাতারে, কিন্তু উপন্যাসেও তাকে শ্রেষ্ঠদের তালিকায় রাখতে হয়তো দ্বিতীয়বার চিন্তা করার অবকাশ থাকতো, যদি এবং কেবল যদি তিনি গোরা না লিখতেন। এই একটা উপন্যাস দিয়েই তাকে অনায়াসে আমাদের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের সারিতে রাখতে বাধ্য হতে হয়। গোরা শুধু তার না, বাঙলা সাহিত্যেরই একটা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস একথা বলতে আমাকে দুইবার ভাবতে হয় না।সুসংহত একটি থিম; সার্থক চরিত্রের সমাহার, তাদের প্রত্যেকের বিকাশ এবং চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য; কাহিনীর পরিণতির দিকে স্বাভাবিক বাস্তবসংলগ্নভাবে এগিয়ে যাওয়া; এবং একটি সার্থক পরিণতি– গোরাতে আধুনিক উপন্যাসের এইসব সার্থকতার লক্ষণের সবই সুস্পষ্ট। বঙ্কিমের কথা মাথায় রেখেই বলতে হয়, গোরার আগে বিশ্বমানের উপন্যাস বাঙলা সাহিত্য কখনো পায়নি। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত বাঙলা উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথকেই তাই পথপ্রদর্শক বলতে হয়।

গোরা চরিত্র

৫. গোরার অসাধারণ চরিত্রচিত্রণ নিয়ে কিছু না বললে এই উপন্যাস নিয়ে কোন আলোচনাই সম্পূর্ণ হওয়ার অধিকার রাখে না। তাই এবার একটু গোরার কিছু চরিত্র বিশ্লেষণ করে উপন্যাসে তাদের প্রয়োজনীয়তা, তাদের স্বাতন্ত্র্য ও মিলের জায়গা, এবং পুরো উপন্যাসের বিস্তারের সাথে তাদের বিকাশের সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করা যাক। গোরাতে চরিত্রের কমতি নেই, এতসব চরিত্রের মধ্যে আমি শুধু ছয়টি চরিত্রকে বেছে নিচ্ছি, কারণ আমার মতে এরাই 'গোরা'।

দুই বন্ধু গোরা এবং বিনয়ের মধ্যে মিলের থেকে অমিলই বেশি, তাদের নামই তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশক। গোরা তার আদর্শের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন, নিঃসন্দেহ এবং আত্মবিশ্বাসী; অন্যদিকে কোন ব্যাপারই বিনয়ের কাছে সন্দেহাতীত নয়। বিনয়ের কাছে তার কাছের মানুষদের গুরুত্ব তার আদর্শের থেকে অনেক বেশি মূল্যবান, যেখানে গোরার আদর্শ তার কাছের মানুষদেরকে সর্বদাই ছাপিয়ে উঠে। এজন্যই আশৈশব লালিত আদর্শ এবং মত বিসর্জন দিয়ে হিন্দু বিনয়ের পক্ষে সম্ভব হয় ব্রাহ্ম ললিতাকে বিয়ে করা, কিন্তু প্রাণের টান থাকার পরও গোরা কিছুতেই সুচরিতার কাছে যেতে পারে না। গোরার গোঁড়ামি অবশ্যই অযৌক্তিক, কিন্তু এই গোঁড়ামিই আবার তার শক্তি, এই গোঁড়ামির কারণেই সে তার দেশকে নিঃশর্তভাবে ভালোবাসতে পারে, প্রান্তিক মানুষদের কাছে গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারে, তাদের জন্য জেলও খাটতে পারে, কিন্তু আবার তাদের হাতের খাবার খাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না। অন্যদিকে বিনয় অনেক বেশি উদারনৈতিক গোরার তুলনায়, কিন্তু এ কারণেই সে কোনকিছুকেই নিঃশর্তভাবে আঁকড়ে ধরতে পারে না। বিনয়কে দেশের জন্য গোরার মত জেল খাটতে চিন্তাই করা যায় না! আবার তার উদারতার কারণেই সে সবার সাথে মিশতে পারে খুব সহজে, সবাইকে জাতপাতের ঊর্ধ্বে রেখে শুধু মানুষ হিশেবে দেখতে পারে।

গোরা আর বিনয় যেমনি পরস্পরের এন্টিথিসিস, তেমনি সুচরিতা আর ললিতা এই দুই বোন পরস্পরের এন্টিথিসিস, যদিও তাদের বৈপরীত্য তাদের প্রেমিকদের মত তীব্র নয়। সুচরিতা উপন্যাসের প্রথম থেকেই উজ্বল, ললিতা প্রথমদিকে সুচরিতার আড়ালে ঢাকা। কিন্তু উপন্যাসের ক্রমবিস্তারের সাথে সাথে ললিতা ক্রমশ সুচরিতাকে ছাপিয়ে গিয়ে দুর্বিনীত হয়ে উঠতে থাকে। ললিতা চরিত্রের মধ্যে আমরা বাঙলা উপন্যাসের একদম আদিম নারীমুক্তির প্রতীককে পাই, যে চরিত্র সমাজ বা পরিবারের সব বাধা ডিঙিয়ে একলা রাতের বেলা এক পরপুরুষের সঙ্গে একটা বোটে চড়ে বসতে পারে, কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বেলায় সমাজ কী বলে তার থেকে কোনটা উচিত এটাই যার থেকে বেশি অগ্রাধিকার পায়, এমনকি নিজের ভালোবাসার মানুষের জন্য আপন সমাজ এবং

ধর্মকেও যে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে ললিতার অযৌক্তিক জেদ অনেক সময়ই আমাদের ধৈর্য্যচূতির কারণ ঘটাতে পারে, কিন্তু যদি আমরা মনে রাখি একটা বিরুদ্ধ সমাজ একজন স্বাধীনচেতা নারীর জন্য কতটুকু দুর্বিষহ, তাহলে তার এই জেদ বরং অনেক বেশি বাস্তব এবং যৌক্তিক মনে হয়। ললিতার পাশে সুচরিতাকে একটা সময় অনেক বেশি মলিন মনে হয়। যে সম্ভাবনা নিয়ে সুচরিতা চরিত্রের সূচনা হয়েছিল উপন্যাস শেষ হতে হতে বরং সে পরিণত হয় বাঙলা উপন্যাসের একটি টিপিক্যাল সর্বংসহা এবং হৃদয়বান নারীতে।

গোরার সবচেয়ে বিস্ময়কর দুই চরিত্র আনন্দময়ী এবং পরেশ। এই চরিত্রদের নিজেদের মধ্যে কথা হয় খুব সম্ভবত একবার, তাও খুব আটপৌরে কিছু একটা নিয়ে। কিন্তু পুরো উপন্যাসেই এদের দু'জনের প্রভাব উপন্যাসের অন্য চরিত্রদের উপর যেন মায়া বিস্তার করে রাখে। তাদের যেকোন কথাবার্তা বা আচার আচরণকে উপন্যাসের বিভিন্ন সময়ে এবং পরিস্থিতিকে একমাত্র সমাধান বলে মনে হয়। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্ররা যখন হতাশা-অবিশ্বাস-সন্দেহের দোলাচলে পর্যুদস্ত তখনও এই দুইজন আশ্চর্যরকমভাবে শান্ত, সৌম্য, এবং নিঃসন্দেহ। তারা যেন সবই জানেন, কিছুই যেন তাদের বুঝার অগম্য নয়। সম্ভবত এই দুইজনের মধ্য দিয়ে ঋষি রবীন্দ্রনাথ নিজেকেই প্রকাশ করেছেন। এই সম্পর্কে আমরা আরও নিশ্চিত হতে পারি যখন শেষ পরিণতিতে আমরা এই দুইজনেরই জয় দেখি। পরেশ আর আনন্দময়ী- এই দুইজনের কাছে তাদের নিজেদের বিশ্বাস বা মত ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতটা গুরুত্বপূর্ণ মানবিকতা। তাদের দুইজনের পার্থক্য শুধু একটা জায়গায়- যেখানে আনন্দময়ী নিজের জীবনের একটা ঘটনা থেকে শিক্ষা পেয়েছেন, সেখানে পরেশ নিজে অনুশীলনের দ্বারা সেই একই শিক্ষা লাভ করেছেন। এই একটা পার্থক্য বাদ দিলে তারা দুইজনেই একই পথের পথিক, সেই পথ যাকে আমরা বলতে পারি সার্বজনীন মানবতার পথ, যেখানে মানবতা ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ সবকিছুর অনেক ঊর্ধ্বে। এই চরিত্রদ্বয়ের খুঁত একটাই, তারা অনেক বেশি নিখুঁত, বাস্তবে একজন পরেশ বা একজন আনন্দময়ী পাওয়ার কথা চিন্তাই করা যায় না। এই কারণেই সমগ্র উপন্যাসের সব চরিত্রদের মধ্যে এই দুইজনই বাস্তবদূরবর্তী সবচেয়ে বেশি, যদিও এরাই সবচেয়ে আকাঙ্খিত।

৬. দ্বিরুক্তি করেই এই প্রবন্ধের ইতি টানবো। এই উপন্যাস অবশ্যপাঠ্য দুই কারণে; এক, যথার্থ মানবিক এবং মানবতাবাদী হওয়ার পাঠ লাভ; দুই, অধ্যাত্মবাদী ঋষি রবীন্দ্রনাথের নতুন পরিচয় প্রাপ্তি। বর্তমান সময়ে যেখানে অমানবিকতা এবং অধ্যাত্মবাদ দুইটিরই জয়জয়কার, সেখানে গোরার থেকে অব্যর্থ ঔষধি আর কিছুর সন্ধান আপাতত আমার জানা নেই।